ডিজিটাল বৈষম্য রাখা যাবে না

মোস্তাফা জব্বার

বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে দেশের প্রাচীনতম বাণিজ্য সংগঠন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির অবদান নতুন করে উল্লেখ করার বিষয় নয়। '৮৭ সালে জন্ম নেয়া এই প্রতিষ্ঠানটির ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমপিউটারের প্রসার, সাধারণ মানুষের কাছে কমপিউটার পৌঁছানোর জন্য শুল্ক ও ভ্যাটমুক্ত আন্দোলন করা থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণা এবং কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা অনবদ্য। এই সংগঠনটিরই একটি কর্মকাণ্ডের নাম তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা কর্মসূচি। সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় দেশের বিভাগীয়, জেলাশহর ও উপজেলা পর্যায়ের সাধারণ মানুষের সামনে তথ্যপ্রযুক্তি তুলে ধরার জন্য দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কমপিউটার সমিতি। বহু বছর ধরে এই কাজটি হচ্ছে। ২০০৮ সালে যখন সমিতির এই কর্মকাণ্ডটি সামনে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ পাই, তখন একে বিশেষ করে নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষায়িত করি। গত পাঁচ বছরে এর পুরো পরিচালনাটিও আমিই করে আসছি। আমার নিজের কাছে এটি এক আনন্দময় কাজ।

সেই সূত্র ধরেই গত ২৬-২৭ এপ্রিল দেশের প্রত্যন্ত জেলা নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় গিয়েছিলাম। নেত্রকোনা আমার নিজের জেলা। এর প্রায় প্রতিটি উপজেলায় আমি গেছি। আটপাড়াতেও গেছি। ১৯৭০ সালে আটপাড়ার প্রার্থী আবদুল খালেক নৌকা মার্কার প্রার্থী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমি তখন তার পক্ষে নির্বাচন করেছিলাম। সেটি আমার জীবনের প্রথম জাতীয় নির্বাচন ছিল। তবে তখনও আমি আটপাড়া চিনতাম না। শুধু তেলিগাতি ও নাজিরগঞ্জ বাজারের নাম শুনেছিলাম। পরে আটপাড়ার তেলিগাতি গেছি নব্বই দশকে। ভাঙা রাস্তা তো বটেই, মাটির রাস্তাতেই চলতে হতো। এবার দেখলাম, সবটাই বদলে গেছে। এখন নেত্রকোনা থেকে শুধু আটপাড়া নয়, তেলিগাতি হয়ে নাজিরগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা মসৃণ হয়ে গেছে। দু'পাশে কাঁচা-পাকা ধানক্ষেতের মাঝখানে পিচঢালা সেই পথে গেলে মনে হবে দুনিয়ার অন্যতম সুন্দর একটি পথ অতিক্রম করছি। আটপাড়া উপজেলা সদরটিও চমৎকার। পরিকল্পিত বৃক্ষায়ণ ছাড়াও আছে গোছানো বাড়িঘর। তবে আমাদেরকে যে মিলনায়তনটিতে অনুষ্ঠান করতে দেয়া হলো সেটি টিনের পুরনো ঘর। তবে বৈশাখের তাপদাহেও তেমন গরম ছিল না। শুধু সমস্যা হলো জায়গাটি খুবই ছোট। অতি কষ্টে আমরা সেখানে শ' তিনেকের মতো প্লাস্টিকের চেয়ার বসিয়ে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করি।

কথা হচ্ছিল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল আউয়ালের সাথে। তিনি জানালেন, আটপাড়ার সবটাই মনোরম। তিনি তার কর্মস্থল থেকে নৌকায় চড়ে আমার বাড়ি খালিয়াজুরির কৃষ্ণপুর যাওয়ার মনোরম অভিজ্ঞতার কথাও আমাকে জানালেন। তবে তিনি জানালেন, আটপাড়ার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এখানে শিক্ষার হার খুবই কম। তার হিসাবে জাতীয় শিক্ষার হার যেখানে শতকরা ৭০ ভাগের কাছাকাছি, সেখানে আটপাড়ায় শিক্ষার হার শতকরা মাত্র ৩৯ ভাগ। তবে একটু আশার আলো হচ্ছে, এর মাঝে মেয়েদের হার বেশি। তবে সেটিও স্কুল পর্যায়েই। উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের হার খুবই কম। এসএসসির আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়াটাকে তিনি এর জন্য দায়ী করেন। ছেলেদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি দারিদ্র্যকে দায়ী করেন। শিশুদেরকে উপার্জনে নিয়োজিত করার জন্যই ওরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না বলে তিনি মনে করেন।

আটপাড়ার এই চিত্রটি বাংলাদেশের অনুন্নত অঞ্চলগুলোর সাধারণ চিত্র। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকা, উপকূল, চরাঞ্চল ও দুর্গম অঞ্চলগুলোয় এটি খুবই সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আমার জন্য সবচেয়ে বিস্ময়ের ঘটনাটি তখনও অপেক্ষা করছিল। সকাল ১০টায় কর্মসূচির উদ্বোধন হওয়ার পর আমি যখন মূল পর্ব পরিচালনা করতে শুরু করি, তখনই প্রথম জানতে চাই তোমাদের মাঝে কার কার নিজস্ব কমপিউটার রয়েছে, হাত তোল। স্তম্ভিত হয়ে আমি মাত্র দুটি হাত দেখলাম। তিনশ'র বেশি শিক্ষার্থীর মাঝে মাত্র দুটি হাত দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ওখানে উপস্থিত থাকা আটপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ জানালেন, অবাক হওয়ার মতো হলেও সত্য, তার কলেজে কোনো কমপিউটার ল্যাব নেই। জানলাম, উপস্থিতদের মাঝে মাত্র চারটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে নবম শ্রেণীতে কমপিউটার পড়ছে। ১৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাত্র পাঁচটিতে রয়েছে কমপিউটার বিষয়ক শিক্ষক। শিক্ষকদের কেউ কেউ জানালেন, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে কমপিউটার বাধ্যতামূলক হলেও স্কুলগুলোর বেশি-রভাগেরই কমপিউটার নেই। প্রসঙ্গত, আমি স্মরণ করছিলাম কিছুদিন আগে নরসিংদীতে এমন একটি প্রোগ্রামে দেখেছিলাম সেখানকার শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীর নিজস্ব কমপিউটার রয়েছে। তারও আগে, অন্তত বছর দুয়েক আগে আমি ঢাকার অক্সফোর্ড স্কুলের শতকরা ৯৪ ভাগ শিক্ষার্থীকে কমপিউটারের মালিক হিসেবে পেয়েছিলাম। আমি আটপাড়ার শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলাম, তাদের কতজনের মোবাইল ফোন রয়েছে। দেখলাম, শতকরা ৩০ জনেরও মোবাইল ফোন নেই। অথচ অক্সফোর্ডে আমি শতকরা ১০০ জনকে মোবাইল ফোনের অধিকারী দেখেছিলাম। আটপাড়ার ছেলেমেয়েরা ইন্টারনেটও ব্যবহার করেন না। যে কয়জন ইন্টারনেটে প্রবেশ করেন তারা বস্তুত কোনো স্পিডও পান না। ইন্টারনেটের খরচ বহন করার ক্ষমতাও বেশিরভাগের নেই।

আমাদের দেশের যারা নীতিনির্ধারক-রাজনীতিক-মন্ত্রী-এমপি, যারা ব্যবসায়ী নেতা, শিক্ষাবিদ বা আমলা তাদের সামনে এ তথ্যগুলো তুলে দিয়ে শুধু জানতে চাই, এই বৈষম্য যাকে আমরা ডিজিটাল ডিভাইড বলি তার অবসানে কি পরিকল্পনা আছে আমাদের? কাদের জন্য আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলছি?

এক সময় আমাদের কাছে এই প্রশ্নটি ছিল না যে কমপিউটার কার হাতে আছে আর নেই। কারণ তাতে কোনো রকমফের হতো না। কিন্তু এখন যখন আমরা দেশটিকেই ডিজিটাল করতে চাই, যখন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাই, তখন যদি দেশের প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ না পায় তবে তাকে কোনোভাবেই যথাযথ বলা যায় না। সংবিধানের সমতা বা মৌলিক অধিকারের যত সুন্দর বুলিই আওড়ানো হোক না কেনো, ডিজিটাল বৈষম্য যদি দূর না করা হয় তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে উঠলেও সেই সুযোগগুলো শুধু ভাগ্যবানদের হাতেই থাকবে।

আমি খুব তত্ত্বকথা না বলেও এই কথাটি বলতে চাই, বিশেষ কোনো উদ্যোগ যদি নেয়া না হয়, তবে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। দেশে ধনী-গরিবের মাঝে ডিজিটাল ডিভাইড রয়েছে। শহর আর গ্রামের মাঝে ডিজিটাল ডিভাইড রয়েছে। পুরুষ আর নারীর মাঝে ডিজিটাল ডিভাইড রয়েছে। শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের মাঝেও ব্যাপক ডিজিটাল ডিভাইড রয়েছে। এটি দিনে দিনে আরও তীব্র হচ্ছে। কারণ এই বৈষম্য দূর করার কোনো প্রচেষ্টা নেই। পরিকল্পনাও নেই।

আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালায় এই ডিজিটাল ডিভাইড দূর করার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তেমন কোনো বিশেষ পরিকল্পনায় ডিজিটাল ডিভাইড দূর করার প্রচেষ্টা আমরা দেখিনি। সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করে আইসিটিকে গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। ডিজিটাল ডিভাইড কমানোর জন্য এটি একটি ভালো প্রচেষ্টা। কিন্তু আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এসব কেন্দ্র খুব পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়নি। বিশেষ করে এসব কেন্দ্র পঙ্গু হয়ে আছে দ্রুতগতির ইন্টারনেটের অভাবে। ইন্টারনেটের এই বৈষম্য পুরো দেশের জন্যই প্রযোজ্য। বিশেষ কয়েকটি জেলা ও ঢাকা শহর ছাড়া পুরো দেশটিতে ইন্টারনেটের গতি নেই বলা যায়। তারের সাহায্যে এসব জায়গায় ইন্টারনেট পৌঁছাতে ব্যয়ও বেশি। অন্যদিকে ইন্টারনেটের ওপর শতকরা ১৫ ভাগ ভ্যাট বহাল থাকায় তার সুবিধা গরিব মানুষ নিতে পারে না। বিগত চার বছরে সরকার সাধারণ মানুষকে এই ব্যয় থেকে মুক্তি দেয়ার কথাই ভাবেনি।

গত চার বছরে দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ কমেছে। কিন্তু ধনী-গরিবের বৈষম্য কমেনি। ফলে ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা এখনও ধনীদের হাতেই রয়েছে। সরকার কমদামী ল্যাপটপ প্রস্তুতের যে প্রচেষ্টা নিয়েছিল সেটিও সফল হয়নি।

অন্যদিকে দেশে শিক্ষার বৈষম্য চরম আকারে বিরাজ করছে। ধনী বা শহুরেদের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে, তা গ্রামের গরিব মানুষের হাতের নাগালে নেই। এরই মাঝে শিক্ষাকে ডিজিটাল করার উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। অথচ এই ডিজিটাল ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার বৈষম্য আরও বাড়বে কি না এবং বেড়ে গেলে সে বিষয়ে কী উদ্যোগ নেয়া হবে, তার কোনো দিকনির্দেশনা আপাতত দৃশ্যমান নয়। কজ

ফিডব্যাক : mustafajabbar@gmail.com